ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No.1540-1545
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

‘অঙ্গার’: স্বাধীন ভারতবর্ষে পরাধীন কয়লা শ্রমিকদের আন্দোলন

ড. শ্রীকান্ত কর্মকার, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, তিলকা মাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার, ভারত*

Received: 20.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Utpal Dutta has shown in his plays that drama can play a major role as a tool to awaken society and protest against injustice. One of his successful plays is ‘Angar’. India became independent in 1947, but the coal industry remained privately owned. Most privately owned coal mines continued to operate without planning, without following safety rules and only for profit, neglecting the interests of workers. As a result, various mining accidents continued to occur. Utpal Dutta wrote the plot of the play 'Angar' in 1959, based on the inhuman torture and exploitation of workers by the owners in the Chinakuri coal mine in 1958, and the self-sacrifice of 183 workers. Many say that Utpal Dutt wrote the play 'Angar' based on the incident that occurred in the Baradhemo coal mine near Asansol city in 1956. The third scene of the play shows that the working class is beginning to become aware and that they will no longer tolerate injustice. Their inner anger soon takes the form of protests outside. They leave work and come out of the mine because gas has accumulated in the mine. It has accumulated. This strike lasted for one and a half months. As a result of this long strike, there was a lot of crying all around. Everyone received some help from the union, but it did not last long. After that, they continued to eat half a meal a day. In the end, they pushed themselves to their deaths by entering the gas pit they had been protesting against for a long time. Looking at the faces of the rest of the family, they thought about their suffering. Utpal Dutt's play 'Angar' was a major step in attracting the attention of the general public and the administration of independent India. It can be said that as a result of which, in March 1973, the then Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, nationalized the coal industry. As a result, everything related to coal came under government regulations and private ownership was abolished. The suffering of the workers was alleviated.

Keywords: Utpal Dutt, Angar, Coal Mine Exploitation, Workers’ Protest, Nationalization of Coal Industry

ইংরেজী সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র এবং শিক্ষক উৎপল দত্ত নাটককে মনে প্রাণে ভালো বাসতেন। আঠারো বছর বয়েসে এই নাট্যানুরাগী ‘দি শেক্সপিরীয়ন’ নামে একটি নাটকের দল তৈরী করেন। মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত ১৯৫১ সালে গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যসিবাদ ও ধনতন্ত্রের বিরোধী এই নাট্যকার ১৯৬৯ সালে ‘পিপলস লিটল থিয়েটার’ গঠন করেন। সমাজকে জাগানো এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার হাতিয়ার হিসেবে নাটক যে বড় ভূমিকা নিতে পারে তা উৎপল দত্ত তাঁর নাটকগুলির মধ্যে দেখিয়েছেন। তাঁর সফল নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম নাটক হল ‘অঙ্গার’।

এক বিশেষ শ্রেণীকে জাগানো এবং তাদের প্রতি অত্যাচারের কথা জনসমক্ষে তুলে আনার প্রয়াস এই 'অঙ্গার' নাটক। এই বিশেষ শ্রেণী হল মালকাটা শ্রেনী বা কয়লা খনি শ্রমিক শ্রেণী। যারা আধুনিক জীবনকে চালিত করছে চির অন্ধকারের কয়লাখাদের মধ্যে থেকে। সভ্য, চিরউজ্জ্বল এবং সভ্যতার অগ্রগতির জন্য কয়লার অবদান যে অপরিহার্য তা আমাদের সকলেরই জানা। 'অঙ্গার' নাটকের পূর্বনাম ছিল 'কালো হীরে'। লিটল থিয়েটার গ্রুপের সভাপতি চিত্ত চৌধুরী 'কালো হীরে' নাম বদল করে নাটকের নাম দিয়েছিলেন 'অঙ্গার'।

আমরা দেখি মালকাটা শ্রেণীর কথা বা কয়লা শ্রমিকের কথা বাংলা সাহিত্যে প্রথম উঠে আসে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কয়লাকুঠি'(১৯২২)গল্পে। কয়লাকুঠি, কয়লাখনি এবং মালকাটা শ্রেণীকে নিয়ে তাঁর একাধিক গল্প ও উপন্যাস আছে। ১৯৩৫ সালে রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে 'কালী-ফিল্মস' এর নিবেদনে শৈলজানন্দের 'পাতালপুরী' চলচিত্র মুক্তি পায়। আধুনিক শিল্প সভ্যতার মূলবীজ কয়লা। আর এই কয়লা যারা তুলে আনে ভূগর্ভ থেকে সেই মালকাটা শ্রেণীর কথা তাদের উপর অত্যাচার, শোষণ, তাদের দুর্দশার কথা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছাড়া তেমন ভাবে বাংলা সাহিত্যে আর কারো লেখায় উঠে আসতে দেখা যায় না।

দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর ১৯৫৯ সালে ৩১ ডিসেম্বর মালকাটা জীবনের শোষন অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিত্র তুলে ধরেন নাটককার উৎপল দত্ত তাঁর 'অঙ্গার' নাটকের মধ্যদিয়ে। দেশবাসীর বহু কাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত স্বাধীনতার বারোটা বছর পরও যে দেশের মানুষ নির্মম ভাবে পরাধীনতার শিকার হতে পারে তার চিত্র আছে 'অঙ্গার' নাটকে।

নাটকের মূল বিষয়ে প্রবেশ করার আগে এবং নাটকটিকে সঠিক ভাবে বোঝার জন্য মালকাটা শ্রেণী ও কয়লাখনি সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া দরকার বলে আমার মনে হয়।

কয়লা নামক ঘন কালো পাথরের মত বস্তুটি আমাদের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাই একে কালো হীরে বা ব্লাক ডায়মন্ড বলা হয়। উৎপল দত্ত 'অঙ্গার' নাটকের এক জায়গায় বলেছেন-

> "কয়লা হোলো প্রস্তরীভূত শক্তি- কতযুগ আগে ওরা ছিল পৃথিবীর বুকের উপর, সূর্যের দিকে আকাশের দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, গভীর অরন্যের রূপে। তার পর একদিন মুখ লুকালো মাটির তলায়- যুগ যুগ ধরে তিল তিল করে সঞ্চয় করল উত্তাপ, বজ্রের শক্তি, পৃথিবীর থেকে, সুর্যের কিরণ থেকে। চেহারা হোলো পোড়া, কালো, কর্কশ ভেতরে রইল অগ্নি সম্ভাবনা, ...।"[১]

এই কালো কর্কশ, কালো হীরে বা অঙ্গার পৃথিবীর অন্ধকার বক্ষ থেকে বাইরে ভারতে প্রথম বেরিয়ে এলো ১৭৭৪ সালে ১২ আগস্ট। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ছয় জন উচ্চপদস্ত আধিকারিক এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা প্রথম পাঞ্চেৎ ও বীরভূমে কয়লার সন্ধান পান। ১৭৭৫ সালে সেখান থেকে ২৫০০ মন কয়লা তাঁরা ভারত সরকারকে সরবরাহ করেন। কিন্তু সেই কয়লা ছিল অতি নিম্ন মানের। এর জন্য তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হল। এর পর কয়লা নিয়ে তেমন উন্মাদনা আর দেখা যায় নি। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর ১৮১৪ সালে এগরা (রাণীগঞ্জে) র কাছে আবার কয়লা তোলার কাজ শুরু করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। স্থান পরীক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভালো কয়লার সন্ধান পেতে থাকেন তাঁরা। ১৮৬০ সাল নাগাদ ৫০টি কয়লা খনি গড়ে ওঠে। এই কয়লাকে কেন্দ্র করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রেল লাইনের যাতাযাত এবং কয়লা পরিবহনের কাজ শুরু করেন। সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে কয়লা অপিহার্য সামগ্রীতে পরিণত হয়। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়তে থাকে। ১৮৬৮ সালের মধ্যে ক) 'বীরভূম কোল কোম্পানী', খ) 'বেঙ্গল কোম্পানী লিমিটেড', গ) 'ইক্যুইটেবল কোল কোম্পানী লিমিটেড' এবং ঘ) 'গোবিন্দ পণ্ডিত সিয়ারসোল' প্রধান এই পাঁচটি সংস্থা থেকে শতকরা ৮৮ ভাগ কয়লা উত্তোলন হত।

কয়লার চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়ানো দরকার হয়ে পড়ে। আর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দরকার ছিল সুলভ শ্রমিকের আর সেই শ্রমিক আসত ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। কয়লা খনির প্রথম দিকে স্থানীয় গ্রাম থেকে শ্রমিক আনা হত। আর এই শ্রমিকদের অধিকাংশ ছিল বাউরী সম্প্রদায়। কারণ বাউরীদের কয়লা খনির কাজে দক্ষতা এবং ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল। পরবর্তী কালে এই কাজে সাঁওতালরা আসতে শুরু করে। খনির সংখ্যা যখন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তখন স্থানীয় শ্রমিকদের ঘাটতি শুরু হতে থাকে ফলে ভারতের অন্ন্যান্য স্থান থেকে শ্রমিকদের আনা হত বা কাজের সন্ধানে তারা নিজেরাই আসা শুরু করেছিল। ছোটনাগপুর থেকে কোঁড়া এবং

সাঁওতালরা আসত। আরা, ছাপরা, বালিয়া, মুঙ্গের বা উড়িয়া, বিলাসপুরী, গোরকপুরী কম বেশি প্রায় সব শ্রেণীর শ্রমিকরা এই কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে একটু ভিন্নতর ছিল গোরকপুরী শ্রমিক। তারা ছিল খুবই বলবান। তারা পরিশ্রম করত বেশি আবার শোষিত ও হত বেশি।

শুধু গোরকপুরীরা নয় সব শ্রেণীর শ্রমিকেরাই কয়লা খনি মালিকদের কাছে শোষিত হত, অত্যাচারিত হত। মালিকদের কাছে তাদের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। খনি গহ্বরে কোন পরিকাঠামোর সুবিধা ছিল না ফলে কেউ খনির মধ্যে কয়লা ধসে মারা যেত বা বিষাক্ত গ্যাসে মারা যেত আবার কেউ সেই অন্ধকার পুরীতে কাজ করে বাইরে এলে যক্ষ্মা, হাপানী বা পেটের রোগে ভুগতো। আবার এর উপর কেউ কাজে ফাঁকি দিলে বা অন্য কোন অভিযোগ থাকলে সর্দার বা ম্যানেজারদের দ্বারা শারিরীক ভাবে অত্যাচারিত হত। এত কিছু কষ্টের পরও হত দরিদ্র মানুষগুলি দু-বেলা খাবার এবং কিছু টাকা পাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারত না। তাই পুরাতনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শ্রমিক আসতেই থাকত।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় কিন্তু কয়লা শিল্প থাকে বেসরকারি মালিকানায়। পরিকল্পনাহীন ভাবে, শ্রমিক স্বার্থ অবহেলিত হয়ে সুরক্ষা নিয়ম না মেনে শুধুমাত্র মুনাফার জন্য অধিকাংশ বেসরকারি মালিকানাধীন কয়লা খনি চলতে থাকে। ফলে বিভিন্ন খনি দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। আর তাতে সাধারণ শ্রমিকদের অকাল মৃত্যু হতে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকে ‘অঙ্গার’ নাটক রচনার আগে পর্যন্ত খনি দুর্ঘটনা বিষয়ক কিছু তথ্য তুলে ধরা হল-

সাল	খনির নাম	দুর্ঘটনার কারণ	শ্রমিক মৃত্যু
১৯৫৩	মাঝারি	জলপ্লাবন	১১ জন
১৯৫৪	ডামরা	বিস্ফোরণ	১০ জন
১৯৫৪	নিউটন চিকলি	জলপ্লাবন	৬৩ জন
১৯৫৫	আমলাবাদ	বিস্ফোরণ	৫২ জন
১৯৫৬	বড়ধেমো	জলপ্লাবন	২৮ জন
১৯৫৮	চিনাকুড়ি	বিস্ফোরণ	১৮৩ জন

১৯৫৮ সালে চিনাকুড়ি কয়লা খনিতে শ্রমিকদের উপর মালিক পক্ষের অমানুষিক অত্যাচার, শোষণ ও ১৮৩ জন শ্রমিকের আত্ম বলিদানকে ভিত্তি করে উৎপল দত্ত ১৯৫৯ সালে ‘অঙ্গার’ নাটকের প্লট রচনা করেন। অনেকে বলেন যে ১৯৫৬ সালে আসানসোল শহরের কাছে অবস্থিত বড়ধেমো কয়লা খনিতে যে জলপ্লাবন হয়েছিল সেই ঘটনা নিয়ে উৎপল দত্ত এই ‘অঙ্গার’ নাটক রচনা করেছেন। ১৯৫৯ সালে কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে লিটল থিয়েটার গ্রুপ দ্বারা এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকের পঞ্চাশতম দিনে বিসমিল্লা খানের সানাইয়ের সুর পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সাজানো হয়েছিল গোটা মিনার্ভা থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহকে। নাটক শুরুর আগে বড়ধেমো দুর্ঘটনায় জীবিত এগারো জন শ্রমিককে স্বয়ং উৎপল দত্ত পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানান। কিন্তু ১৯৫৬ সালের থেকে ১৯৫৮ সালের ঘটনা অনেক ভয়াবহ ছিল। প্রতি বছর একাধিক বার কয়লা খনিতে দুর্ঘটনা হতেই থাকত আর সাথে সাথে শ্রমিকের মৃত্যু ও হতেই থাকত। ১৯৫৮ সালে হওয়া ঘটনা খনি শ্রমিকদের প্রতি অতাচারের চরম সীমায় পৌঁছায়। তাদের এই সমস্যা থেকে, তাদের প্রতি যে অত্যাচার চলছিল তার থেকে তাদের উদ্ধারের জন্য তাদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব জাগানো খুবই দরকার ছিল। যে কাজটা স্বয়ং উৎপল দত্ত করেন।

শ্রমিক শ্রেণী, মজুর শ্রেণী চিরকাল ধরে মালিক এবং উঁচু তলার মানুষের কাছে শোষিত অবহেলিত হয়ে আসছে। ব্যতিক্রম কয়লা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ও হয়নি। বিনোদ ডাক নাম বিনু। কয়লা খনিতে কাজ করে অনেক টাকা সঞ্চয় করবে এবং তার পর শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে একটা বাড়ি তৈরী করে আনন্দের সঙ্গে সেখানে বাস করবে। ছোট বোন সুমনাকে পড়াশুনা করিয়ে তার বিয়ে দেবে আরো কত তার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন নিয়ে দূর সম্পর্কের দাদা দিনুর কাছে শট্‌ফায়ারের কাজ শিখছে। বিনুর মা বিনুকে বলেছে “ঐ খাদের কাজ – ও বড় ভয়ানক”[২] উত্তরে বিনু বলেছে “ও কয়লা নয় মা, ও কালো হীরে! ঐ তুলে এনে ছুঁইয়ে দেবো আমাদের এই ঘরে, হঠাৎ দেখবে সব স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেছে।”[৩]

কয়লা সত্যিই 'কালো হীরে' এর ছোঁয়ায় উনুন জ্বলছে, ট্রেন চলছে, জাহাজ চলছে, বিজলিবাতির আলো জ্বলছে, কল-কারখানা চলছে আরো কত কী। প্রস্তর যুগের পর লৌহ যুগ আর তার পর এসেছে কয়লার যুগ। তাই যারা সেই কয়লার সঙ্গে মহৎ যজ্ঞে লিপ্ত ছিল তাদের কোন স্বপ্নই বিফল হবার ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদীরা ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সবটাই আত্মসাৎ করে নিতে সদা সচেষ্ট থেকেছে।

বারো বছর ধরে কয়লা খাদে কর্মরত দীনু একদিনের জন্যও সে কাজে অনুপস্থিত হয়নি। সে শট্‌ফায়ারের কাজ করত। শট্‌ফায়ার অর্থাৎ কয়লার খাদে ড্রিল করে তাতে বারুদ ভরে বিস্ফোরণ করিয়ে কয়লা চ্যাঁই ফাটাতো। ১২ তারিখ খনির মধ্যে বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হলে শেলড কোম্পানির আধিকারিকেরা অস্বীকার করে বলেছে সেদিন সে কাজে অনুপস্থিত ছিল। তার মৃতদেহ পাওয়া যায় পঁচিশ মাইল দূরে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায়। গ্যাস ভর্তি খাদানে শট্‌ফায়ার করতে পাঠিয়ে মালিক পক্ষ তাকে পরোক্ষ ভাবে হত্যা করে দেহ অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে যাতে কেউ সন্দেহ না করে।

কোর্টে কোম্পানীর অপরাধ প্রমাণিত হলেও অপরাধীর কোন সাজা বা ক্ষতি পূরন হয়নি। শ্রমিক ইউনিয়ন পোস্টার লাগায় "দীনু মুখুজ্যের হত্যাকারীদের শাস্তি চাই!"[৪] কিন্তু এই ইউনিয়ন নাম মাত্র ছিল তার কোন ক্ষমতা ছিল না। ইউনিয়নের নেতারা মালিক পক্ষের সঙ্গে মিলে থাকত। জলু বাগদী সে এক নম্বর পিটের মালকাটা। যেখানে সে কাজ করত সেখানের যে মুনসী ছিল সে তার কাছে অসৎ ভাবে টাকা চায়ত। টাকা না দিলে সে লিখবে না যে টব ভর্তি হয়েছে। জলু রাগে বলেছে "সারাদিন কয়লা কেটে একটা টব ভর্তি করলাম, আড়াইটি টাকা পাব। তা থেকে আবার ঘুষ।"[৫] ... "কি যে করি দরখাস্ত লিখে লাভ নেই, ইউনিয়ন স্বীকার করে না।" [৬] তখন আরিফ বলে ওঠে "মার দাও, মার।"[৭]

নাটকের তৃতীয় দৃশ্য থেকে দেখা শ্রমিক শ্রেণী সচেতন হতে শুরু করেছে এবং তারা যে অন্যায়কে আর প্রশ্রয় দেবে না তার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। তাদের ভিতরের ক্ষোভ বাইরে বিক্ষোভের রূপ নেয় শীঘ্রই। খাদে থেকে তারা কাজ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে তার কারণ খাদে গ্যাস জমেছে। কুদতৎ বলেছে,

> "আইন আছে সুড়ঙ্গ ষোল ফুটের বেশী চওড়া হবে না, নইলে গ্যাস জমে। এখানে তো বাইশ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। দেখুন আপনারা টাকার লোভে কয়লা কাটতে কাটতে কি ভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করে কোম্পানী।"[৮]

এই ভাবে শ্রমিক শ্রেণী ধীরে ধীরে একত্রিত হতে শুরু করে। হটাৎ কাজ বন্ধ করার জন্য ম্যানেজার দত্ত সকলকে ভয় দেখাতে থাকে যে তোমরা মাইনে নিয়েছ এরকম বেইমানি করলে তার ফল ভালো হবে না। তখন জয় বলে "মাইনের জন্য জান দিয়ে আসবো?"[৯] কুদরৎ বলে "মাইনে যা দেন তার বহুগুণ বেশি মুনাফা আপনাদের সিন্দুকে জমা করে দিই।"[১০] ম্যানেজার দত্ত যখন বলেছে যে তোমরা বেআইনি ভাবে কাজ বন্ধ করেছ তখন কুদরৎ সংগঠন এবং প্রতিবাদকে শক্তিশালী করার জন্য উপযুক্ত জবাব দিয়ে বলেছে "১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের কয়লাখনি আইনের ১৪৫ ধারায় স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে খাদের গ্যাস বেড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সমস্থ মজুরকে বাইরে তুলে আনতে হবে।"[১১] সেই আইন কোম্পানী মানে না। কুদরতের কথায় স্পষ্ট হয়েছে যে শ্রমিকরা বেইমান নয় বেইমান হচ্ছে মালিক পক্ষ।

এই সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতা হিসাবে কুদরতকে উঠে আসতে দেখি। সে সকলকে এক সাথে হাত মেলানোর কথা বলেছে এবং নিজেদের ভালো মন্দ বুঝে নেওয়ার কথা বলেছে। দীর্ঘদিন ধরে মালিকপক্ষ তাদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার করে আসছে তা জনগণের সামনে তুলে ধরে সকলকে জাগ্রত করতে চাইছে। এমন সময় কোম্পানীর সুবেদার মহাবীর সিং এবং গফুর এসে উপস্থিত হয়। মহাবীর সিং বলে "সবাই বাইরে কেন?"[১২] কুদরৎ বলে "নীচে গ্যাস জমেছে"[১৩] শ্রমিকদের পক্ষে আরো কিছু কথা কুদরৎ বলতে গেলে মহাবীর তাকে মুষ্টাঘাত করেছে। এর পর সনাতন প্রতিবাদ করলে তাকে মারে, মারের চোটে সে মাটিতে পড়ে গেলেও তাকে কলার ধরে তুলে আরো মারে। রমজান প্রতিবাদ করলে তাকে সুবেদার গফুর মারে। মারের চোটে রমজান মাটিতে পড়ে যায়। এর পর বিনোদ এগিয়ে আসে। মহাবীরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে "মানুষের - মানুষের গায়ে হাত দেন? ঐ হাত ভেঙ্গে দেব আমরা।"[১৪] এই কথা শুনে মহাদেব বিনোদকে রুল তুলে মারতে এলে শ্রমিক শ্রেণী

তার পাল্টা জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। শট্‌ফায়ারার হাফিজ বলে ওঠে "গায়ে হাত দিয়ে দেখুন।"[১৫] একত্রিত শ্রমিক "কেউ গাঁইথি কুড়োচ্ছে, কেউ শাবল, কেউ বা এক খণ্ড কয়লা।"[১৬] একত্রিত শ্রমিক শ্রেণীকে দেখে দুই সুবেদার মহাবীর ও গফুর পিছু হটে যায়। দীর্ঘ শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচারের ফলে শ্রমিকরা একত্রিত হয় এবং তাদের প্রতিনিধি কুদরৎ ঘোষণা করে "যত দিন না গ্যাস পরিষ্কার হচ্ছে, ততদিন হরতাল।"[১৭] একদিন দুইদিন করে এই হরতাল দেড়মাস কেটে যায়। মালিক পক্ষের কোন পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। এদিকে শ্রমিক শ্রেণী অনাহারে মরতে থাকে। শ্রমিক একতা ভাঙার জন্য প্রতিবাদী শ্রমিক নেতা কুদরৎ কে কোম্পানী বিনা দোষে জেলে বন্দি করিয়ে রাখে।

কয়লা খনির ইতিহাসে এই সময়ের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পায় ১৯৫৬ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর এমনই হরতাল শুরু হয়েছিল। এই হরতাল ভাঙার অনেক চেষ্টা মালিক পক্ষ করেছিল কিন্তু তাতে সফল হয়নি। শ্রমিকদের খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কেটে দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ একমাস ধরে এই হরতাল চলেছিল কিন্তু কোন ফল শ্রমিক শ্রেণী পায়নি বরং বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছিল। সে বছর ১৭ অক্টোবর আবার কয়লা খনি চালু হয়েছিল।

নাটকেও দেখি যে এই দীর্ঘ হরতাল হওয়ার ফলে চারিদিকে হাহাকার শুরু হয়ে যায়। ইউনিয়ন থেকে কিছু সাহায্য পেত সকলে কিন্তু তা দিয়ে বেশিদিন চলেনি। এর পর একবেলা আধপেটা খেয়ে চলতে থাকে। বিজলির আলোও কেটে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম এবং মালিক পক্ষের বিরুধে হরতাল চালিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু দারিদ্রের বজ্রমুষ্টি শ্রমিকদের দিক শূণ্য এবং অসহায় করে তুলেছিল। দিশা হারা হয়ে কেউ কেউ কাজ করার কথা ভেবেছে। যার প্রতিবাদে তারা দীর্ঘ হরতাল চালিয়ে যাচ্ছিল সেই গ্যাস জমা খাদে প্রবেশ করে নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। পরিবারের অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের কষ্টের কথা ভেবে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'অঙ্গার' একমাত্র নাটক যা মালকাটা শ্রেণী বা কয়লা শ্রমিকদের জীবনের দুর্দশা, অত্যাচার, শোষণ এবং তার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে একত্রিত করে সংগ্রামের লক্ষে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সাধারণ কৃষকদের উপর নীলকর শাষকদের যে অত্যাচার তার রূপ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পন' নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণ ভাগ চাষীদের উপর জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের রূপ আমরা বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকে দেখতে পায়। একই সঙ্গে দেখতে পাই ভাগ চাষীদের একত্রিত প্রতিবাদের চেহারা। একই ভাবে উৎপল দত্ত 'অঙ্গার' নাটকে কয়লা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিতে সংগ্রামের পথে নিয়ে গেছেন। শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তুলতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয় সাধারণ জনগণ এবং স্বাধীন ভারতের প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' নাটক রচনা অনেক বড় পদক্ষেপ ছিল। বলা যেতে পারে যার ফল স্বরূপ পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে মার্চ মাসে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কয়লা শিল্পের জাতীয় করণ করেন। আর এর ফল স্বরুপ কয়লা সম্পর্কিত সব কিছু সরকারী নিয়মের আওতায় চলে আসে ব্যক্তিমালিকানা উঠে যায়। শ্রমিকদের কষ্টমোচন হয়।

'নীলদর্পন' নাটকে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে নীলকর সমস্যার সমাধান হয়েছে। আবার জমিদার অত্যাচার জমিদার রাজ বিলোপ হয়ে পঞ্চায়েতি রাজ শুরু হয়েছে 'দেবীগর্জন' নাটকের শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। 'অঙ্গার' নাটকে খনি শ্রমিক বা মালকাটা শ্রেণীর সমস্যা মিটে সরকারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের একত্রিত লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে। কথায় আছে দশের লাঠি একের বোঝা। সমাজে ঘটে চলা যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে একত্রিত হয়ে লড়া খুবই জরুরী। একত্রিত লড়াই সমাজের যেকোন সমস্যার সমাধান আনতে পারে।

স্বাধীনতার পর মানুষ ধীরে ধীরে এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে যে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। যৌথ পরিবারে মানুষ থাকতে পছন্দ করে না। নিজের ক্ষুদ্র পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। তাই পাশের বাড়ির সুখ দুঃখের খবর আমাদের কানে এসে পৌঁছায় না বা আমরা জানতে চায় না। সামাজিক বা পারিবারিক নয় আমরা মানসিক ভাবেও বিছিন্ন বা ব্যস্ত থাকতে বেশি পছন্দ করি। রবীন্দ্রনাথের কথায় "মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র।"[১৮] আমাদের এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিচ্ছে দেশের নোংরা রাজনীতি। নিজের স্বার্থে সব কিছু সহজেই মেনে নেওয়ার মনোভাব আমাদের মধ্যে চলে এসেছে। আমাদের একত্রিত লড়াইয়ের জন্যই আজ আমরা আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা কে বাস্তবে পেয়েছি।

আসলে হয়ত মানুষের ধর্মই তাই, যতক্ষণ আমাদের সামনে কোনো বড় বিপদ বা সমস্যা না আসে ততক্ষণ আমরা একত্রিত হতে পারি না। পদ, সম্পদ, সম্মানের অহঙ্কারের শক্ত প্রাচীরে এক জন আরেকজনের থেকে আলাদা থাকি। হটাৎ সামনে কোন বড় বিপদ ঘনিয়ে এলেই সব শক্ত প্রাচীর ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং আমরা একত্রিত হয়ে উঠি।

তথ্যসূত্র:

১। দত্ত, উৎপল। নাটক সমগ্র- প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ: ১০৮।
২। তদেব, পৃ: ৭৭।
৩। তদেব, পৃ: ৭৭।
৪। তদেব, পৃ: ৯১।
৫। তদেব, পৃ: ৯৬।
৬। তদেব, পৃ: ৯৬।
৭। তদেব, পৃ: ৯৬।
৮। তদেব, পৃ: ১০১।
৯। তদেব, পৃ: ১০২।
১০। তদেব, পৃ: ১০২।
১১। তদেব, পৃ: ১০২।
১২। তদেব, পৃ: ১০৩।
১৩। তদেব, পৃ: ১০৩।
১৪। তদেব, পৃ: ১০৫।
১৫। তদেব, পৃ: ১০৫।
১৬। তদেব, পৃ: ১০৫।
১৭। তদেব, পৃ: ১০৫।
১৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র। কামিনী প্রকাশন, ২০১৮, পৃ: ৩৩১।